ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
রাজা রাউত (জলপাইগুড়ি)-৯৪৭৪৪১৭১৭৮
তুহিন শুভ্র মন্ডল (বালুরঘাট)-৯৪৭৫৯৩১২৯০
অভিজিৎ অধিকারী (চাকদহ)-৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯
ময়ূখ ব্যানার্জী (কোচবিহার)-৯৪৭৪৮৩১০৮৬
সৌম্যকান্তি জানা (কাকদ্বীপ)-৯৪৩৪৫৭০১৩০
সুরজিৎ দাস (কাঁচরাপাড়া)-৯৪৩২৬৮৬৫১০
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী)-৯৪৭৭০৬৪৭০৪

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
অমিত কুমার নন্দী (চুঁচুড়া)-৯৪৩৩৯০৬৬২৩
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য (নদীয়া)-৯৪৩৪১১০৯৬৯
গ্রাহক মূল্য : বার্ষিক ১০ টাকা,
যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড,(বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৭ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১০ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১ টাকা

বিজ্ঞানমনস্ক রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ তাঁর বিভিন্ন রচনায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। প্রকৃতি ও মানব অনুভূতি সমূহের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাক্ষর রাখে। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যেমন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন, একই ভাবে প্রথাবহির্ভূত যে জনশিক্ষা সেখানেও বিজ্ঞানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান আনে মুক্তি— তমসা থেকে, জড়তা থেকে, অন্ধতা থেকে মুক্তি। সে মুক্তি শুধু ব্যক্তি মানুষের ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিফলন ঘটে। এ কথাও উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"পশ্চিম দেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে, যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে।" (শিক্ষার মিলন)

এরপর 2 পাতায়

বাঘ সংরক্ষণ একটি ভাবনা

ভারত বিশ্বের অন্যতম বন্যপ্রাণী বৈচিত্র সম্পন্ন দেশ। সারা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রায় ১৬ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে ভারতে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা ৪ লক্ষ প্রায় যা সারা পৃথিবীর ৮ শতাংশ। বিশ্বের বারটি মহা বৈচিত্র্য Mega Diversity যুক্ত অঞ্চলের মধ্যে দুটিই রয়েছে এই দেশেই। এই মুর্হুতে ভারতে প্রায় ২৫,০০০

এরপর 5 পাতায়

বিশ্বব্রহ্মান্ড ও নক্ষত্রধূলি

রাত্রের আলোকিত শহরের বেশ কিছুটা বাইরে অবস্থিত কোন স্থান থেকে পরিষ্কার অন্ধকার আকাশপটে নজর রাখলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিট্ মিট্ করছে এমন শত শত তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে যেমন দেখতে পাই তেমনই হঠাৎ করে নজরে পড়ে প্রায় মাথার উপর অবাক করা আকাশ চিরে বিস্তৃত এবং উভয় দিকে প্রসারিত এক আলোকিত পথের অবস্থান। বাস্তবে এটি হল কোটি কোটি— তারার সমন্বয়ে গঠিত আলোর নদী বিশেষ যাকে আমরা 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথ (Milky way galaxy) বলে থাকি।

এই 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথকে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকেরই মনে হয়, এটা মহাকাশের প্রান্তে অবস্থিত এমন কোন কিছু যা আমাদের থেকে বহু বহু দূরে। সত্যি বলতে কী 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথের যে সমস্ত তারাকে আমরা দেখতে পাই তাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই অবস্থান আমাদের থেকে অনেক দূরে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান মতে এই ছায়াপথের প্রান্তীয় কোন বিন্দু থেকে বিপরীত প্রান্ত বিন্দুর দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ (আলোক বর্ষ হল আলো তার নিজস্ব বেগে চলে এক বছর সময়ে যতটা পথ অতিক্রম করে যার প্রকৃত মান ৯.৪৬x১০^{১৯} কিলোমিটার)। আরও বাস্তব সত্য হল এই মহাবিশ্বে 'আকাশগঙ্গা' ছায়াপথের মধ্যেই আমাদের পৃথিবীর অবস্থান এবং আমরা প্রত্যেকেই এর অংশ বিশেষ।

আরো সুনির্দিষ্ট করে আমাদের অবস্থান বোঝাতে গেলে বলতে হয় 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথের কেন্দ্রীয় চক্র বিন্দু (Central hub) থেকে সরাসরি কোন প্রান্ত বিন্দুর দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রহে আমরা রয়েছি। এই ছায়াপথস্থিত ২০০

এরপর 4 পাতায়

গঙ্গা নদী দূষণ

গোমুখে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। ২,৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা ন'টি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছোটবড় ১০০টি শহর ও শহরাঞ্চল এবং হাজার হাজার গ্রামকে পরিপুষ্ট করছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, গঙ্গা দূষণের একটা বড় কারণ তীরবর্তী শহরগুলির পুরসভার ছাড়া বর্জ্য তরল। এর পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন নালা দিয়ে বয়ে আসা নোংরা জল, শস্যক্ষেতে ব্যবহৃত তীব্র রাসায়নিক কীটনাশক, খোলা জায়গায় এমনকী গঙ্গায় মল ও

এরপর 7 পাতায়

রবীন্দ্রনাথ....

1 পাতার পর

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চর্চার কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'বিশ্বপরিচয়'-এর কথা। এই প্রবন্ধ সংগ্রহটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন স্নেহাস্পদ্ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। মুখবন্ধে প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।"

তাঁর আলোচনা তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন পরমানুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক এবং ভূলোক— এই কটি বিষয়ের মধ্যে। রচনাটি সাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যটি ছিল সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। যা তাঁর নিজের ভাষায়—"বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে অবৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে বৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের নক্ষত্রলোক প্রবন্ধে তিনি বর্ণনা করেছেন আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব-যার প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ সালে তিনি লিখেছেন, 'বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়, তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন সেকিড তারার সাহায্যে কী করে বার করা যায় তারার দূরত্ব। তিনি লিখেছেন, "একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো জোয়ার-ভাঁটায়, একবার কমে একবার বাড়ে।...এদের নাম হয়েছে সিফাউডস। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নক্ষত্র জগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।" দূরত্ব বার করার উপায় প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯১২ সালে হেন্‌রিয়েটা লেয়াভিট-এর গবেষণায়।

মহাবিশ্ব যে প্রসারমান, সে কথা তিনি বলেছেন। "কাছের দুটো-তিনটে ছাড়া বাকী নক্ষত্র জগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে।...এইসব নক্ষত্র জগতের সৃষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি,... সে ক্রমশই ফুলে উঠছে।" একথা জানা গিয়েছিল ১৯২৯ সালে এড্‌উইন হাব্‌ল-এর পর্যবেক্ষণ থেকে।

পরমাণুলোকের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন মেঘনাদ সাহার আবিষ্কৃত একটি সূত্র ব্যবহার করে কী করে সূর্যে বিভিন্ন পরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। আজও যেগুলি গরঠিকানা, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শুষে নেয়।' এই সূত্র এবং তার সম্ভাব্য প্রয়োগের কথা মেঘনাদ সাহা আলোচনা করেছিলেন ১৯২০-২১ সালে লেখা কয়েকটি গবেষণাপত্রে।

রবীন্দ্রনাথ পাঠককে পজিট্রন কণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের 'পরমাণুলোক' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'মোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে, কিন্তু এমন এক জাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।' রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯৩৮ সালে, পজিট্রন কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। আবিষ্কার করেছিলেন সিডি অ্যান্ডারসন। এখানে বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান জগতের সর্বাধুনিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি কতখানি ওয়াকিবহাল থাকতেন।

নিউট্রন কণা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রোজেনের পরমাণু সাধারনের চেয়ে ডবল ভারী। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রস্থলেই প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। পূর্বেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী। তার কেন্দ্রের শরিকটিকে পরখ করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়। অতএব সে বিদ্যুৎ ধর্ম বর্জিত। ...এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন।" নিউট্রন কণা আবিষ্কৃত হয় ১৯৩২ সালে। আবিষ্কার করেন জেমস স্যাডউইক। আলোকের তরঙ্গ-ধর্ম ও কণা-ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ কত সহজ করে সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর "বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের 'পরমাণুলোক' প্রবন্ধে।

"আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর পেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গীটা কি রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে, তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে—ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু; মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে হাজির হল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে; অতি খুদে ছিটে গুলির মতো ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উল্‌টো খবরের মিলন হল কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উল্‌টো কথা আছে সে হচ্ছে এই যে, বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা না এটা, না-ওটা, তাকে আমরা বলি আলো-এর মানে কী, কোনো পন্ডিত তা বলতে পারলেন না।"

নক্ষত্রের আলোর উৎস আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনো একটি হিলিয়ামের পরমাণু সৃষ্টি করা যায় তা হলে সেই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচন্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে এক সর্বনাশী প্রলয়কান্ড ঘটবে।...এই রকম কান্ডটাই ঘটছে নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যে।"— ('সৌরজগৎ'/ বিশ্বপরিচয়)

মহাকাশ ও তার গ্রহ-নক্ষত্ররাজি কবি মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাধিক রচনায় আমরা তার প্রকাশ দেখতে পাই—

"...ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চালিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,....' (ছবি/বলাকা)

এরপর 3 পাতায়

রবীন্দ্রনাথ....

3 পাতার পর

অথবা "আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।"

উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপার বিস্ময়ে, মহাজাগতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জাগতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

প্রাণের প্রথম সৃষ্টির দিনে প্রাণীকূলের রক্ষণের দায়িত্ব যাঁর সেই সূর্য প্রথম প্রাণের জন্ম পরিচয় জানতে চেয়েছিল, পারেনি। সূর্যাস্তের এক শান্ত সন্ধ্যায় এসেও কিন্তু সেই রহস্য তার কাছে অনাবৃত হল না।

"প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—/ কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।/বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে/নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?/ পেল না উত্তর"—(প্রথম দিনের সূর্য/ শেষ লেখা)

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের বর্তমান পরিমন্ডল এবং গঠন সম্বন্ধে এক কাব্যিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন

"শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে/ছিল হাওয়ার আর্বত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,/ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।/দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।/ কেন হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে/আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,/বহে না কলমুখরা নির্ঝরিনী।"—
(উদাসীন/পত্রপুট)

পল্লীগ্রাম ছিল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি। গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। 'পল্লী প্রকৃতি' প্রবন্ধে পল্লী সমাজের উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনি সত্যযুগ আসবে।"

বোলপুরের কাছে শ্রীনিকেতনে কৃষি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে, গ্রামীন মানুষের কাছে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণও করেছিলেন।

রাশিয়ার চিঠিতে তিনি বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীর সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কাজ ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

'বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে।"

প্রবন্ধ শেষ করবো। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-ভাবনার এমন হাজারো নজির ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায় লেখায়। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ।

গোবিন্দ দাস, গ্রাম ও পোঃ সওনা-৭৪১২৪৫, নদিয়া,
ফোন ঃ ৯৩৩২৪৩১১০২

কেন হারিয়ে গেল
ডাইনোসরেরা

নানা মতবাদের আড়ালে রয়ে গেল ডাইনোসরদের এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার রহস্য। কেন এই দৈত্যাকার প্রাণীগুলির হারিয়ে গেল এই পৃথিবী থেকে? প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর আগে যে প্রাণীগুলো পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াতো, তাদের কেন হঠাৎ করে হারিয়ে যেতে হলো? এ বিষয়ে যে সব মতবাদ আছে তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল—

১) আবহাওয়ার পরিবর্তন এর একটি কারণ রূপে চিহ্নিত, মেসোজাইক যুগের শেষভাগে এই পরিবর্তন হয়তো ডাইনোসরদের মুছে দেয় এই পৃথিবী থেকে। শৈত্যাধিক বা অত্যধিক উষ্ণ আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে তারা হয়তো হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো।

২) অনেকে মনে করেন—খাদ্যাভাব এবং খাদ্যবস্তুর পরিবর্তন এদের অবলুপ্তির জন্য দায়ী। বিভিন্ন ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের স্থানে সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব হবার কারণে উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরদের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয় ফলে তাদের মৃত্যু ঘটতে থাকে।

৩) বিভিন্ন সংক্রামক অনুজীবদের আক্রমণের ফলেও হয়তো ডাইনোসরদের অবলুপ্তি ঘটতে পারে।

৪) আর একটি মতবাদ হল—স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব। স্তন্যপায়ীরা এই সরীসৃপদের ডিম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করে। ফলে এদের সংখ্যা হ্রাস পায়।

৫) Over Specialization ও Racial Senescence (জাতিগত প্রাচীনত্ব) এর জন্য এরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয় বলে অনুমান করা হয়।

৬) ভূ-পৃষ্ঠের হঠাৎ পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতিও এদের অবলুপ্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

৭) ডাইনোসরদের কঠিন আবরণে আবৃত ডিমের ওপর থাকত অসংখ্য স্তরাবরণ। ফলে, সেই ডিমের মধ্যে শ্বাসবায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ও ডিম ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এছাড়া এরূপ ডিম প্রসব করার ফলে স্ত্রী ডাইনোসরদের রক্তে ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষা হত না। ফলে তারা অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

৮) এছাড়া বিভিন্ন প্রজাপতির মধ্যে সংগ্রাম তাদের বেঁচে থাকার পরিপন্থী হয়ে ওঠে।

৯) খাদ্যের অভাবের কারণে তারা নিজেদের শাবকদের হত্যা করা শুরু করে, যা তাদের বংশরক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১০) পৃথিবীর নিকটবর্তী কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট Radiation এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।

১১) সে যুগে পৃথিবীর ওপর অত্যাধিক উল্কাপাত এই অবলুপ্তির একটি কারণ হিসেবে মনে করা হয়। —তবে এইসব মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বির্তক রয়েছে। কোনো একটি মাত্র কারণ ডাইনোসরদের অবলুপ্তির জন্য দায়ী নয়। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, মহাজাগতিক ও অন্যান্য কারণ—ডাইনোসরদের অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

—ময়ূখ ব্যানার্জী, কোচবিহার, ৯৪৭৪৮৩১০৮৬

নক্ষত্রধূলি

1 পাতার পর

বিলিয়ন (১০০ কোটি=১ বিলিয়ন) বা আর বেশি তারার কোন একটিকে (সূর্য) কেন্দ্র করে আবর্তনশীল।

এই মহাবিশ্বে ছায়াপথ মন্ডল (galactic cluster) কে বাদ দিলে ছায়াপথগুলির কাঠামোই সবচেয়ে বড়। একটি ছায়াপথ মূলতঃ কোটি কোটি তারা, গ্যাসীয় পদার্থ, ধূলিকণা এবং আরও সব উদ্ভট পদার্থের (exotic matters) বিশাল সমন্বয়—যারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ রয়েছে। এখন পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী বলা যায় কোন একটি ছায়াপথে যত সংখ্যক তারার অবস্থান, মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কমপক্ষে ১২৫ বিলিয়ন ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ছায়াপথগুলির গঠন মূলতঃ পেঁচানো (spiral) উপবৃত্তাকার (elliptical) এবং অনিয়তাকার (irregular) এই তিন ধরণের হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশেষতঃ এই গঠনগুলিই স্বাভাবিক ও স্থায়ী গঠন বৈচিত্র্য। ছায়াপথ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে ছায়াপথের মধ্যে তারার জন্ম হয় কি ভাবে সেই বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে এখন আমরা জানব।

মেঘমুক্ত রাত্রের অন্ধকার আকাশে দৃশ্যমান তারাদের প্রত্যেকটিই কমপক্ষে আমাদের সূর্যের মতো এক একটি বিশাল আকৃতির জ্বলন্ত ও অতিমাত্রায় উত্তপ্ত অগ্নি গোলক। আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা হল সূর্য—যা পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরত্বে রয়েছে। এই বিশাল দূরত্বের কারণে সূর্যের বিকিরিত তাপ আমাদের উত্তপ্ত করতে পারলেও দগ্ধ করতে পারে না। বহু দূরে অবস্থান করার করাণেই তারাদের আমরা ছোট ছোট আলোকিত বিন্দুর আকারে দেখি। এদের প্রকৃত বিশালতা আন্দাজ করতে হলে উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে সূর্যের মত একটি সাধারণ মানের তারার মধ্যে ১০ লক্ষ পৃথিবী স্থান করে নিতে পারে।

আমাদের পৃথিবীর মত তারারা কিন্তু কঠিন বস্তু নয়। বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি সূর্যের জীবন শুরু হয়েছিল আজ থেকে আনুমানিক ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে পাক খাওয়া ধূলিকণার মেঘ থেকে যার অধিকাংশই ছিল মৌলিক হাইড্রোজেন। এই মেঘ পাক খেতে খেতে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পরবর্তী দ্রুত থেকে দ্রুততর প্রলম্বিত হতে হতে তা একটি ঘুরন্ত চাকতির আকার ধারণ করে। এই সময় এর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং অবশেষে মূল কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পারমানিবকি সংযোজন বিক্রিয়া শুরু হয়ে লেনিহান শিখা সহ জ্বলতে থাকে এবং চারদিকে তীব্র হারে আলোক শক্তির বিকিরণ হতে থাকে।

'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথে এই ভাবে ২০০ বিলিয়ন তারার জন্ম হয়েছে। এখনও এই প্রক্রিয়ায় অনবরত তারার জন্ম হয়ে চলেছে। ছায়াপথের মধ্যে এছাড়াও চলছে পৃথিবীর মত নতুন নতুন গ্রহ জন্মের প্রক্রিয়া।

'আকাশগঙ্গা' ছায়াপথ প্যাঁচানো ছায়াপথগুলির অন্যতম একটি। মহাবিশ্বে প্যাঁচানো ছায়াপথগুলিই সাধারণতঃ বেশি সক্রিয় ও উজ্জ্বলতর। ছায়া পথের প্যাঁচালো বাহু যার নাম 'কালপুরুষ বাহু' এর ভিতরের দিকে এক প্রান্তীয় অঞ্চলে আমাদের সূর্য সহ সৌর জগতের অবস্থান যা কিনা মহাবিশ্বে আমাদের প্রকৃত অবস্থান।

'আকাশগঙ্গা' ছায়াপথ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যা কিছু তথ্য আমরা জানি বা জানতে পেরেছি তা অন্যান্য দৃশ্যমান ও 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথের সমতুল্য ছায়াপথগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'আকাশ গঙ্গা' ছায়াপথে সূর্যের সঠিক অবস্থানও ঐ সমস্ত তথ্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

থালা বা ডিশ্ আকৃতির এই ছায়াপথের মধ্যে আনুমানিক ১০,০০০ কোটি তারার অবস্থান হলেও যেহেতু আমরা এই ছায়াপথের মধ্যেই রয়েছি সেই কারণে খালি চোখে আমরা ৫০০০ এর মতো তারা সাধারণ দেখতেপাই। অনেকগুলিই আবার অভ্যন্তরীন গ্যাস ও ধূলিকণায় ঢাকা পড়ে যায় আরও কিছু তারার অবস্থান ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের মধ্যবর্তী হওয়ায় আমরা তাদের দেখতে পাই না।

নেবুলা হচ্ছে একটি তারার মৃত্যুকালীন বা তার পরবর্তী সময়ে উৎপন্ন গ্যাস ও ধূলিকণা সমূহের এক বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা। অবলোহিত রশ্মি ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের ছায়াপথের উপকণ্ঠে অবস্থিত পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করলে ছায়াপথকে একটা উড়ন্ত ছোট থালা বা ডিশের মতো দেখায় যার কেন্দ্রে দেখা যায় এক উজ্জ্বল স্ফীত অংশ যেখানে বহু তারা পাশাপাশি আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই কেন্দ্র থেকে বাহিরের দিকে ক্রমশঃ আলোর ঘনত্ব হালকা হতে থাকে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তারাগুলির বয়স বেশি হওয়ায় সেগুলিকে যৌবন প্রাপ্ত তারাদের তুলনায় হলুদ দেখায় অপর পক্ষে ছায়াপথের প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থানরত নতুন তারাগুলিকে উজ্জ্বল নীল দেখায়।

'নেবুলা' হল মহাবিশ্বের অন্যতম একদিকে দৃষ্টিনন্দন অপর দিকে ভীতিপ্রদ নাক্ষত্রিক পরিস্থিতি যা আমাদের ছায়াপথের প্যাঁচালো বাহুগুলির মধ্যে হামেশাই দেখা যায়। এগুলিই হল নতুন তারা জন্মানোর সবচেয়ে সক্রিয় এলাকা। মূলতঃ নেবুলা হল গ্যাসীয় পদার্থ ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল মেঘের মতো যার উদ্ভব হয় তারার মৃত্যুকালীন অবস্থায় তীব্র বেগে বেরিয়ে আসা পদার্থ সমূহের পুনরায় একত্রীভূত হওয়ার মাধ্যমে। মহাবিশ্বের কোন কিছুরই বিনাশ ঘটে না। তারাদের যেমন মৃত্যু ঘটছে তেমনিই আবার তা থেকে নতুন তারার জন্ম ঘটছে।

মহাবিশ্বে আদিম পারমাণবিক মৌল হিসাবে অস্তিত্ব ছিল কেবল মাত্র হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের। এই মৌল দুটি তারা গঠনে সক্ষম হলেও জীব সৃষ্টি করতে পারে না। জীব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আরও

এরপর 7 পাতায়

বাঘ সংরক্ষণ....

1 পাতার পর

প্রজাতির মাছ, ১৮২টি প্রজাতির উভয়চর, ৩৮৯টি প্রজাতির সরীসৃপ (পৃথিবীতে ৫ম স্থান) ১২০০ প্রজাতির পক্ষী (পৃথিবীতে ৮ম) এবং ৩১৭ স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, গত দু'হাজার বছরে প্রায় ১০৬টি প্রজাতির বন্যজন্তু ও ১৩৯টি প্রজাতির পাখী পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর যে সমস্ত প্রাণীর পরবর্তীকালে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে বাঘ (Tiger) অন্যতম।

সাধারণ পরিচিতি

বাঘ স্তন্যপায়ী (Mammalia) শ্রেণীর বিড়াল গোত্রের (Felidae) সবচেয়ে বড় বন্যপ্রাণী। বিশ্বের ৬৫ শতাংশ বাঘ এবং এশিয় হাতি পাওয়া যায় এখানেই। শক্তিতে, গাম্ভীর্যে, শৌর্যে, বীর্যে, চলার ভঙ্গিমায় সৌন্দর্য্যে, সবার উপরে বাঘ, তাই যুগযুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পকলা, সাহিত্য, পৌরানিক কাহিনী, ধর্মীয় আবেগ ও মনোভাব এবং ধারণায় বাঘ বেশি স্থান পেয়েছে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার প্রাচীন শিল্প কলায় ও সিলমোহরের নিদর্শনে, সাইবেরিয়া ও চীনের লোক সাহিত্যে, ঋকবেদ, অর্থবেদর বিভিন্ন শ্লোকে, বৌদ্ধজাতকে, সাঁওতাল পুরান প্রভৃতিতেও স্থান পেয়েছে বাঘ। হিন্দু পৌরাণিক লোক গাথায় শিবদুর্গার বাহন। শিবপুরানেও কালীর বাহন বাঘ। উত্তরবঙ্গের আদি জনজাতি 'কোচ' রাজ পরিবারের কুলদেবতা ও রানীরবাহন বাঘ। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে 'বনবিবি' ও 'দক্ষিণ রায়', উত্তরবঙ্গে 'ভান্ডাবনী', 'সোনারায় মহাকাল', 'ব্যাঘ্রভন্ড' এরকম অনেক লৌকিক দেবতা বা দেবতার বাহন হিসাবে পুজো করা হতো বা হয়।

অতীতকাল থেকে শুরু করে আজও কখনও বাঘকে দেবতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কখনও বাঘ-মানুষের সংখ্যাতে উভয়ই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বাঘ অন্যতম নীরোগ প্রাণী হওয়ায় বার্ধক্যজনিত কারণে ২৫ থেকে২৬ বছর বয়সে এদের স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়া রোগভোগে অকাল মৃত্যু সাধারণত হয় না। বনে বাঘের প্রাকৃতিক শত্রু বলতে একমাত্র বন্য কুকুর যাদের দলবদ্ধ, সুচতুর ও ক্ষিপ্র আক্রমণের সামনে এঁরা অসহায় হয়ে পরে। কখনও কখনও শিশু বাঘকে কুমীরও আক্রমণ করে থাকে।

উল্লিখিত ৮টি প্রজাতির বাঘের মধ্যে সাইবেরিয়ান বাঘ সবচেয়ে বড় জীবিত প্রজাতি যাদের আনুমানিক সংখ্যা ১৬০-২৩০টি। আর বালি বাঘ (লুপ্ত) সবচেয়ে ছোট। ক্যাস্পিয়ান বাঘ ও জাভা বাঘ এখন লুপ্ত। বঙ্গীয় (ভারতীয়) বাঘ আনুমানিক ২৫০০-৩৫০০টি, দক্ষিণ চীনা বাঘ আনুমানিক ১৫-৩০টি, সুমাত্রীয় বাঘ আনুমানিক ৩০০-৪০০টি এবং ইন্দোচীনায় বাঘ আনুমানিক ১০০০-১৫০০টি আজও বেঁচে আছে।

১৯৯৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাঘ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক

বাঘের বিভিন্ন প্রজাতি

সাধারণ বাংলা নাম	সাধারণ ইংরাজী নাম	বিজ্ঞান সম্মত নাম
১) বঙ্গীয় (ভারতীয়) বাঘ	Royal Bengal Tiger	*Panthera tigris*
২) ক্যাসপিয়ান বাঘ	Caspian Tiger	*Panthera virgata*
৩) সাইবেরিয়ান বাঘ	Siberian Tiger	*Panthera artica*
৪) জাভা বাঘ	Javan Tiger	*Panthera sondaica*
৫) দক্ষিণ চীনা বাঘ	South Climese Tiger	*Panthera amoyensis*
৬) বালি বাঘ	Bali Tiger	*Panthera balica*
৭) সুমাত্রীয় বাঘ	Sumatran Tiger	*Panthera sumatrae*
৮) ইন্দোচীনীয় বাঘ	Indo-chinese Tiger	*Panthera carbehi*

এরপর 6 পাতায়

বাঘ সংরক্ষণ....

5 পাতার পর

আলোচনা চক্র অনুসারে সারা পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা হবে আনুমানিক ৪৬০০-৭৭০০ এর মধ্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে (১৯২০ সাল) ভারতে বাঘ ছিল ৪০,০০০। ১৯৪০ সালে ৩০,০০০ এবং ১৯৬০ সালে কমে দাঁড়ায় ১৫০০০ এর মত। ১৯৭২ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৮০০। ১৯৯৩ সালে WWF.India-র তরফে বলা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন ব্যাঘ্র বনভূমিতে মোট ৩৭৫০টি বাঘ রয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মোট বাঘের সংখ্যা ৩৩৫টি (১৯৯৩)। সাম্প্রতিককালে খবরে প্রকাশ হয় যে সারিস্কা ব্যাঘ্র বনভূমিতে (রাজস্থান-দিল্লী সীমান্তে) একটিও বাঘ নেই। বিষয়টি গোচরে আসার পর তড়িঘরি করে সংসার চন্দের মত বন্যপ্রাণী পাচারকারী মাফিয়াকে দিল্লী থেকে ধরা হয়। প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকে নড়ে চড়ে বসেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে বাল্মিক থাপরের মত বাঘ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি টাইগার টাস্ক ফোর্স (TTF) গঠন করেন বাঘ বাঁচাতে। অথচ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর কমবেশি সবদেশেই বাঘ শিকার যজ্ঞ চলছে।

ভারত সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের (Tiger Project) কাজ শুরু করে যাতে বাঘ স্বাভাবিক ভাবে তাদের নিজ বাসভূমিতে বসবাস করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গেও দুটি ব্যাঘ্র প্রকল্পযুক্ত বাঘ বন আছে, যার একটি বিশ্ব বিখ্যাত সুন্দরবন (যেখানকার বাঘেরা অন্য বন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ খেতেই বেশি ভালোবাসে) ও অপরটি হল উত্তরবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প যুক্ত বাঘবন।

বাঘ কমে যাওয়ার কারণ

এক সময় বাঘ হিন্দুকুশ থেকে সাইবেরিয়া এবং ভূমধ্যসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিচরণ করত, অথচ আজ বাঘের সংখ্যা দিন দিন সীমিত হয়ে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় কতগুলো এলাকাতে।

বাঘের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বাঘ শিকার হলেও, অন্যান্য আনুসাঙ্গিক দিক্‌ও রয়েছে। বনভূমির ক্রমাগত সংকোচন যার ফলে একদিকে বাঘ তার স্বাভাবিক আবাস হারাচ্ছে অপর দিকে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যাও দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে। এমনিতেই একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের জীবন ধারণের জন্য গড়ে বছরে ৩০০০ কেজি মাংসের প্রয়োজন। এছাড়া বন্য প্রাণীর সাথে মানুষের সংঘাতও একটি অন্যতম কারণ।

বহির্বিশ্বে বাঘ হত্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে (বিশেষ করে চীনা সমাজে) প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক অন্ধ বিশ্বাস। এদের সমাজে বাঘের হাড়, লিঙ্গ, দাঁত, নখ প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান চাহিদাই বাঘকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। বাঘের হাড়সহ অন্যান্য দেহাংশ থেকে ঐ সমস্ত দেশে তাদের পরম্পরাগত বিভিন্ন ধরণের ওষুধ, লঘু খাদ্য এবং স্মারক বস্তু তৈরি করা হয়। এরা এখনও বিশ্বাস করে যে বাঘের হাড়ের গুঁড়ো ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে ও বাতের ব্যাথার উপশম করতে অত্যন্ত কার্যকরী। বাঘের হাড় ও অন্যান্য দেহাংশ থেকে তৈরি বিভিন্ন ওষুধ ও পানীয় মানুষকে শক্তিমান, বীর্যবান করে তোলে, বাঘের গোঁফ ও দাড়ি দাঁতের ব্যাথা সারাতে সাহায্য করে ইত্যাদি।

বর্তমানে চীন ছাড়াও তাইওয়ান, কোরিয়া (উঃ ও দঃ), হংকং ও জাপানে বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির বড় বড় সব বাজার গড়ে উঠেছে।

আজ বাঘ শিকার বন্ধ করতে হলে সবার আগে বিদেশে (বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়) বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির বাজার বন্ধ করা ও সেদেশের জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ১৯৯৩-৯৪ সালে বাঘ বসবাসকারী ১৪টি দেশকে নিয়ে বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় যা CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) নামে পরিচিত। ৫টি দেশ যেমন ভূটান, মায়ান্‌মার (বার্মা), কম্বোডিয়া, লাওস এবং উত্তর কোরিয়া এই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেনি। আবার ঐ বছরই মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাঘ বসবাসকারী ও বাঘের হাড়সহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন দেশকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বেআইনী বাঘহত্যা ও পাচারের বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু সম্মেলনে চীনের অনুপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই মাঝে মধ্যে এখনও বাঘের গর্জন আর্তনাদের মতো শোনায়, সে যেন বলতে চায়—আমাকে বাঁচতে দাও।

রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব,
৯৪৭৪৪১৭১৭৮

তথ্যসূত্র ঃ—

১) ভারতে বাঘ হত্যা—প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী
২) EIA-Report
৩) Science Reporter
৪) Utsa Manus Nov' 1997
৫) Sanctuary Asia
৬) Tiger Link

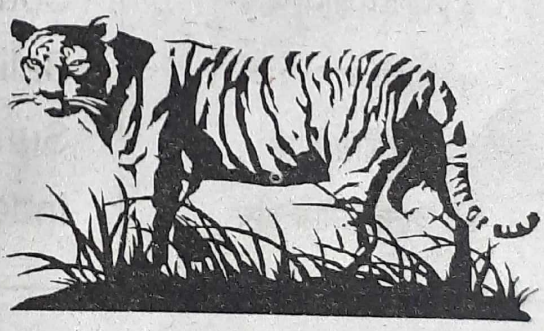

গঙ্গা দূষণ.....

1 পাতার পর

মূত্র ত্যাগ পশুপাখির শবদেহ এবং এমনকী মানুষের শবদেহ গঙ্গায় ফেলা—এই সমস্ত কারণে গঙ্গাজল প্রচন্ড দূষিত হচ্ছে এবং হয়ে উঠছে ব্যবহারের অযোগ্য। কিছু কিছু জায়গায় গঙ্গাজল থেকে বর্ষাকালেও দুর্গন্ধ বেরোয়। নদীর পক্ষে যা বিষবৎ, সেই পলিব্যাগ গঙ্গাতীরে তো বটেই, এমনকী জলেও মানুষ ফেলছে অবলীলায়। কী শিল্পকারখানা, কী ব্যক্তিমানুষ—সকলের কাছেই গঙ্গা যেন আবর্জনা ফেলার এক বিশাল ডাস্টবিন। গ্রীষ্মকালে কোথাও কোথাও গঙ্গা এতটাই অগভীর যে সেই কালো কাদাজল হেঁটেও পেরোনো যায়। কোথাও ট্যানারির বর্জ্য জলও গঙ্গায় সরাসরি ফেলা হচ্ছে। এ সব কিছুই গঙ্গার শুদ্ধতাকে নষ্ট করছে।

কোথাও কোথাও গঙ্গাজলে স্নান করাটাও অস্বাস্থ্যকর। ওই সমস্ত জায়গায় চরম দূষণকারী উপাদান—কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি গঙ্গাজলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে। পেটের নানা রকম অসুখ হতে পারে এই ব্যাকটেরিয়া থেকে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের নির্ধারিত মান অনুযায়ী ১০০ মিলিলিটার জলে ৫০০-র কম কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া থাকলে সেই জল স্নানের উপযুক্ত। অথচ কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় ১০০ মিলিলিটার গঙ্গাজলে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ১৪ লক্ষেরও বেশি।

গঙ্গা তীরবর্তী শহরগুলিতে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব

কলকাতার 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ' দেশের দুটি গঙ্গা তীরবর্তী শহর নবদ্বীপ ও বারানসীতে সেখানকার বাসিন্দা ও গঙ্গাজল সরাসরি ব্যবহারকারী মানুষদের উপর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা চালিয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ওই দুটি শহরের সম সংখ্যক এমন কিছু মানুষের মধ্যেও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা চালানো হয়, যাঁরা সচরাচর গঙ্গাজল ব্যবহার করেন না। সমীক্ষায় দেখা যায়, দুটি শহরেই গঙ্গা তীরবর্তী এবং গঙ্গার জল ব্যবহারকারী মানুষদের মধ্যে ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমির মতো জলবাহিত রোগ এবং এর পাশাপাশি চর্মরোগে আক্রান্তের হার যথেষ্ট বেশি। আবার এই দুটি শহরে গঙ্গা থেকে অনেকটা দূরে থাকেন এবং গঙ্গার জল সরাসরি ব্যবহার করেন না, এমন মানুষদের মধ্যে এই ধরণের রোগের প্রকোপ বহুলাংশে কম বলে সমীক্ষায় ধরা পড়েছিল।

নক্ষত্রধূলি

4 পাতার পর

কিছু ভারী মৌল যেমন—কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি। প্রথম প্রজন্মের তারার অভ্যন্তরে অবস্থিত পারমাণবিক চুল্লীর অতি উচ্চ তাপমাত্রায় হাল্কা মৌলগুলি পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভারী মৌলে পরিবর্তিত হয়। প্রথম প্রজন্মের তারার মৃত্যু কালীন বিস্ফোরণের ফলে তার ভরের অধিকাংশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারার বিস্ফোরণ জাত ধূলিকণা ও গ্যাস সমূহ একত্রিত হয়ে নেবুলার উদ্ভব হয়। যেহেতু নেবুলার উৎপত্তি নক্ষত্রধূলি থেকে সুতরাং আমাদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে নক্ষত্র ধূলি।

সূর্যের জন্ম প্রক্রিয়াকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে আমরা এক টাইম মেশিনে চড়ে ৪৬০০ কোটি বছর পূর্বে সময়ে চলে এসেছি। আমাদের নজরে আসবে প্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন মাইল জুড়ে এক গ্যাস ও ধূলিকণার অবিন্যস্ত ঘূর্ণী। হঠাৎ করেই এক উত্তেজনাকর তরঙ্গ মালা ঐ মেঘের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভ্যন্তরস্থ গ্যাস ও ধূলিকণা সমূহকে আলোড়িত করতে থাকে এবং সেগুলির ক্রমশঃ বেশি করে কাছাকাছি নিয়ে আসতে থাকে। সম্ভবতঃ মূল উত্তেজনা সৃষ্টির প্রধান কারণ নিকটবর্তী কোন তারার বিস্ফোরণ। এই ঘটনা ক্রমে তীব্র অভিকর্ষীয় বলের উদ্ভব হয় ফলে কণাগুলি একত্রিত হতে থাকে।

সবচেয়ে বড় কথাটি হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত ঘটনাই বিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়মে ঘটে এবং এর ব্যতিক্রম কখনই ঘটে না। বিজ্ঞানী মহলের দৃঢ় বিশ্বাস এই মহাবিশ্বের অন্য যে কোন প্রান্তে পৃথিবী সদৃশ গ্রহের অস্তিত্ব সম্ভব কিন্তু তার প্রমাণ নানা কারণে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠেনি।

—প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী
E-mail : chakrabartypradip.keya@gmail.com
ফোন : ৯৪৭৫০৯৫৩০৯

নদীকে পরিষ্কার রাখতে হলে কী করা যাবে, কী করা যাবে না

১) নদীতে স্নান করুন কিন্তু প্রাতঃকৃত্য সারবেন না।
২) নদী বা নদী তীরে কোনও ময়লা বা আবর্জনা ফেলবেন না।
৩) আবর্জনা ফেলতে হলে নদীতীরে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলুন, না থাকলে নদী তীর থেকে দূরবর্তী কোনও জায়গায় আবর্জনা ফেলুন।
৪) নদীর ধারে কাছেও প্লাস্টিকের জিনিস বা পলিব্যাগ নিয়ে যাবেন না।
৫) নদীর মধ্যে বা পাড়ে পুজোর ফুল বা এই জাতীয় কিছু ফেলবেন না, ফেললে নদীর শুদ্ধতাকে নষ্ট করা হয়।
৬) নদীর জল বিভিন্ন শোধনাগারে শোধিত হয়ে আমাদের পানের উপযুক্ত হয়, তাই নদীতে ব্যবহার্য দূষিত জল ফেলার অধিকার আমাদের নেই।
৭) নদী পথে আমরা যাতায়াত করি কিন্তু যাতায়াতের সময় নদীকে নোংরা করা যাবে না।
৮) মোটরচালিত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ বা অন্য কোনও জলযানের জ্বালানি তেল যাতে নদীতে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
৯) উৎপাদনের জন্য শিল্প-কারখানাগুলি নদীর জল কাজে লাগায় কিন্তু বর্জ্য জল সেই নদীতেই ফেলার অধিকার তাদের নেই।
১০) নদীর জল সেচখালের মাধ্যমে কৃষি খেতে গিয়ে ফসল ফলাতে সাহায্য করে, তাই রাসায়নিক কীটনাশকযুক্ত শস্যখেতের বর্জ্য জলও নদীতে ফেলা অপরাধ।
১১) বর্জ্য জল—তা সে কৃষি হোক, শিল্পের হোক কিংবা বাড়ির—নদীতে ফেলার আগে উপযুক্ত শোধনাগারে শোধন করে নেওয়া বাধ্যতামূলক।
১২) নদী তীরের কাছাকাছি প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে খুব শীঘ্র সেই সব সামগ্রী জল ও পাড় থেকে তুলে ফেলতে হবে।

সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'গঙ্গা তুমি কেমন আছো'

।। বিজ্ঞান-সংবাদ।।

১। অঙ্ক কষার চেয়ে কম্প্যুটারের মাধ্যমে ঝড়ের পূর্বাভাষে বড় মাপের সাফল্য : এর ফলে গত বছরে সব বড় ঝড় সম্পর্কে প্রায় ১০০ শতাংশ নির্ভুল পূর্বাভাষ দেওয়া গেছে।

২। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে যুগান্তকারী সাফল্য : বর্তমানের চালু পদ্ধতিতে যেখানে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে তার বদলে এই নতুন পদ্ধতিতে মাত্র ৯০ মিনিটে জানা যাবে রোগীর সক্রিয় ও সংক্রামক যক্ষ্মা রোগ রয়েছে কিনা। এই রোগীর (HIV) সংক্রামণ থাকলে তাও জানা যাবে।

৩। সরীসৃপের বিবর্তন : আমাদের জানা সব সরীসৃপ ডিম পাড়ে এবং তা থেকে শিশু-সরীসৃপ জন্য নেয়। অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রজাতির সরীসৃপ ইদানিং ডিম না পেড়ে সরাসরি জীবন্ত বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে।

৪। স্টিফেন হকিং ভগবানের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন? খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর সাম্প্রতিক বইতে জানিয়েছেন বর্তমানে বিজ্ঞান জেনেছে সৃষ্টি রহস্যের মূলে রয়েছে প্রকৃতি, তাই 'সৃষ্টিকর্তা' হিসাবে ভগবান এখন অবান্তর হয়ে পড়েছেন'।

৫। প্রায় নিখরচায় বর্তমানের চেয়ে ৮০ হাজার গুণ দ্রুততায় জল শোধন: ন্যানো প্রযুক্তিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড ২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে নিরাপদ পাণীয় জল পাওয়া যাবে।

৬। বিকল্প-শক্তির উৎস সন্ধানে-১: ম্যাগনেসিয়াম।

ক) ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেনের চেয়ে ১০ গুণ বেশী শক্তি ধারণ করে।

খ)সমুদ্রের জলে যে পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম আছে তা আমাদের ৩ লক্ষ বছর ধরে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিতে সক্ষম।

৭। বিকল্প-শক্তির উৎস সন্ধানে-২ : সমুদ্র স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা। বায়ুচালিত টার্বাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা আমরা জানি। তিরুপতিতে যারা গেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেনও। সমুদ্র স্রোতের কাছে বায়ুর টার্বাইন চালানোর ক্ষমতা নিঃশ্বাসতুল্য অকিঞ্চিৎকর। তাই বহুবিধ প্রচেষ্টা চলছে সমুদ্র স্রোতের ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের।

৮। বিকল্প-শক্তির উৎস সন্ধানে - ৩ : সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় ভার কমছে। সৌর শক্তি সবচেয়ে সহজলভ্য ও নিরাপদ এবং চিরন্তন শক্তির উৎস এটা দীর্ঘদিন যাবৎ জানা। সমস্যা এর উৎপাদনের ব্যয়ভার নিয়ে। আশা জাগানো খবর বাণিজ্যিক ভাবে সৌর শক্তি উৎপাদনের ব্যয়ভার সম্প্রতি দ্রুত কমছে এবং ৫ বছর আগের তুলনায় তা ৫০ শতাংশ কমেছে।

৯। যান্ত্রিক নিঃশ্বাস পরীক্ষায় ক্যান্সার নির্ণয়ন : সোনার ন্যানো-পার্টিকল ব্যবহারকারী সেন্সর বা 'ইলেক্টনিক-নাক' নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে জানাতে পারছে-

ক) সে নিঃশ্বাস সুস্থ মানুষের না ক্যান্সারগ্রস্থের।

খ) বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের পার্থক্য নিরূপণ করতেপারছে।

গ) খুব প্রাথমিকস্তরে এবং দ্রুত ক্যান্সার নিরূপণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। — *ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ৯৪৩২৯৪১৯২৯*

চিচিং ফাঁক

সংকলক - তপন চন্দ

✷

তুক-তাক, ফুঁক-ফাঁকে
থাকে যদি বিশ্বাস,
ভালো নয় তা মোটেই
হতে পারে সর্বনাশ।

✷

জড়িবুটি তেলমালিশ
শিকড় বেঁধে, কান ফুঁড়ে-
ধর্মের নামে বুজরুকি সব
ভাঙ্গা হাড় সে নিজেই জোড়ে।

✷

'দাঁতের ফাঁকে জর্লভরা ঘট'
ভুত জিন বধে কত কেরামতি
গুণিন ফকির দেখায় দাপট
বুজরুকি সব, রোগীর ক্ষতি।

✷

জ্যোতিষীরা মানুষ ঠকায়
কৌশলে বা ছলে বলে।
চন্দ্র-সূর্য-রাহু-কেতু
এদেরও তারা 'গ্রহ' বলে।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijjnan@yahoo.co.in